ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 479-486
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.234

আশাকাঙ্ক্ষী মানুষের অন্তর্লোক উদ্ঘাটনে বনফুলের প্রথম উপন্যাস ‘তৃণখণ্ড’

ড. বরুণ কুমার সাহা, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 20.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Writer Balaichand Mukhopadhyay, who is popularly known as Banaphul, has contributed a lot to the Bengali fictional literature in twentieth century. Like Conan Doyle, Archibald Joseph Cronin, Somerset Maugham, Anton Chekhov— Banaphul was also professionally a doctor. Impact of professional experiences of Balaichand in the novel and short stories may be considered as a significant and exceptional contribution in Bengali literature. In this research article we have mainly focused on the first novel of Balaichand Mukhopadhyay ‘Trinakhanda’ which was published at his young age in 1935. Professional experiences, poetic sense and philosophical thought of the writer have merged in ‘Trinakhana’ artistically and the writer presented that with literary excellence. In this research work we will also highlight how the writer revealed the hopes and aspirations of human mind in artistic manner.

Keywords: Banaphul, Novel, Trinakhanada, Human mind, Literary Presentation

বনফুল নামের খ্যাত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস ‘তৃণখণ্ড’ যা প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। লেখকের বয়স তখন প্রায় ছত্রিশ। ব্যক্তিজীবনের পর্যবেক্ষণ শক্তি, ডাক্তারি অভিজ্ঞতা, জীবনজিজ্ঞাসা ইত্যাদি অর্জিত জ্ঞান অভিনব শৈলীতে উপস্থাপন করে প্রথম উপন্যাসেই যেন নিজের সাহিত্যিক সম্ভাবনা ও উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা ও সেটার শিল্পরূপায়ণের মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর উপন্যাসের যাত্রা শুরু করেন। মেডিকেলের ছাত্রাবস্থাকালেই তাঁর মধ্যেকার ডাক্তারি ও লেখক সত্তার সম্পৃক্তভাব জেগে ওঠে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন—

> “মেডিকেল কলেজে আমি অনেক সময় খালি ক্লাসরুমে বসিয়া থাকিতাম। প্রকাণ্ড ঘরে নির্জন গ্যালারিতে বসিয়া থাকিতে খুব ভালো লাগিত। নির্জন পরিবেশ না হইলে আমি লিখতে পারি না। মেডিকেল কলেজের খালি ক্লাসরুমগুলিতেই সেই নির্জনতা পাইতাম। একদিন ‘বাড়তি মাশুল’, ‘অজান্তে’, প্রভৃতি চার-পাঁচটি গল্প একসঙ্গে লিখিয়া ফেলিলাম। লিখিবার পর মনে হইল এগুলি গল্প হইল তো?”[১]

বলাবাহুল্য, তাঁর ক্ষুদ্র পরিসরের এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল। পেশাগত জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়ে তিনি চিকিৎসা জগতের বিশাল ক্ষেত্রে একজন সফল ডাক্তার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পাশাপাশি আহরণ করতে লাগলেন মানব জীবনের নানা অধরা দিকগুলি। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে তিনি আলিমগঞ্জ হাসপাতালে চাকরি পেয়েছিলেন এবং পরে সেটা ছেড়ে দিয়ে নিজেই প্র্যাক্টিস শুরু করেন।

একদিকে ডাক্তারি পেশা এবং অন্যদিকে সাহিত্য রচনার নেশা, এই দুই-এর মধ্যে খুব মসৃণ ভাবে বনফুল নিজের ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন। আমরা জানি যে মহান সাহিত্যিক Anton Chekhov-ও পেশায় একজন ডাক্তার ছিলেন এবং নিজের এই দুই সত্তা সম্পর্কে একটি চিঠিতে তিনি জানিছিলেন,

> "I felt more confident and satisfied with myself when I reflect that I have two professions and not one. Medicine is my lawful wife and literature is my mistress; when I get tired of one, I spent the night with the other."[২]

চেখবের এই বক্তব্যটি বনফুলের ক্ষেত্রেও সুন্দর ভাবে প্রযোজ্য বলে মনে হতে পারে। হয়তো সেজন্যই রাজশেখর বসু খুব তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—

> "বঙ্কিম ডেপুটি যথা, রবি জমিদার
> তেমনি ভিষক তুমি বিধির বিধানে
> নেশা তব মানিল না পেশার বাঁধন
> বনফুল দিল চাপা বলাই ডাক্তারে"[৩]

বনফুলের পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ও একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। বনফুল 'উদয়-অস্ত' উপন্যাসটি পিতার স্মৃতিতে লিখেছিলেন। বনফুল নিজেই বলেছেন,

> "আমাদের বাড়িতে দিন রাত রোগীদের ভিড় লেগেই থাকত। তাঁদের নরনারায়ণ জ্ঞানে তিনি (পিতা) সেবা করতেন, আজকের মতো ভিখারী বিদায়ের রেওয়াজ ছিল না। ফলে বাবাকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। আমাদের যা কিছু হয়েছে তার পেছনে ছিল এই অগণিত আরোগ্য-কামী মানুষের আশীর্বাদ ও শুভকামনা।"[৪]

অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে মানব সেবার মহান কর্মটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পেছনে ছিল তাঁর পারিবারিক সংস্কার, পরিবেশ ও শিক্ষা। চিকিৎসা সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার পর সেই পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে সঞ্চিত নানা রকম প্লটগুলি তিনি গল্প-উপন্যাসে সার্থক ভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে এক অসাধারণ ভাবনা নিয়ে মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি লিখে ফেললেন জীবনের প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড'[৫]। এরকম আরও বেশ কয়েকটি উপন্যাস তিনি লিখেছেন যেখানে ডাক্তার চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বা ডাক্তারি প্রসঙ্গ রয়েছে, যেমন— 'বৈতরণী তীরে', 'কিছুক্ষণ', 'নির্মোক', 'অগ্নীশ্বর', 'হাটেবাজারে', 'ত্রিবর্ণ', 'তীর্থের কাক', 'এরাও আছে' ইত্যাদি।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'তৃণখণ্ড' সার্থক উপন্যাস হয়েছে কি-না, এই নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে চান। প্রথম অবস্থায় পরিমল গোস্বামী এই রচনাটি শনিবারের চিঠিতে ছাপাতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি, কারণ রচনাটি তাঁর অপছন্দ হয়েছিল। তবে কপিল ভট্টাচার্য উপন্যাসটির মধ্যে নতুনত্ব খুঁজে পান এবং উৎসাহের সঙ্গে ছাপান। এর জন্য বনফুল অগ্রিম ১০০ টাকাও লাভ করেন[৬]। বলা যেতে পারে যে এটাই ছিল বনফুলের ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ ও উপার্জন। এক্ষেত্রে আত্মজীবনী পশ্চাৎপটে তিনি বলেছেন,

> "সাহিত্য চর্চা করিয়া যে অর্থাগম হইবে, একথা কখনও ভাবি নাই। কিন্তু সেই অর্থ যখন আপনি আসিতে লাগিল, তখন পুলকিত হইলাম।"[৭]

এবার আমরা 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব এবং দেখাব যে কীভাবে ডাক্তারি অভিজ্ঞতা, কবিত্ব প্রতিভা ও দার্শনিক ভাবনার ত্রিবেণী সঙ্গম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে উপন্যাসটি।

বিষয়বস্তু আলোচনা: ডাক্তারি অভিজ্ঞতা-পুষ্ট ও উত্তম পুরুষে বর্ণিত 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসটির নায়কের মধ্যে বনফুলের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখক মানুষের শারীরিক রোগ-ব্যাধির পাশাপাশি মানব মনের বিচিত্রতার দিকটাকেও আলোকপাত করে উপন্যাস জগতে নিজের হাতটাকে পাকিয়ে নিয়েছেন। তার মতে—

> "আশ্চর্য মানুষের মন। আমার নিজের মনের দিকে তাকাইয়া দেখি আর বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই।"[৮]

উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে তেমন কোনও ধারাবাহিকতা নেই, বরং মনে হয় বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলিকে লেখক এক সঙ্গে গেঁথেছেন যা স্বতন্ত্র ভাবে একেকটি বনফুলি ঢঙের ছোটগল্প বা অণুগল্প হয়েও উঠতে পারে। অবশ্য কাহিনির তুলনায় এখানে গুরুত্ব পেয়েছে লেখকের জীবনাভিজ্ঞতা, মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে টিকে থাকার লড়াই ও ভাবুক নায়কের হৃদয়ের উত্থান-পতনের ছবি। উপন্যাসের শুরুতেই বলাইচাঁদের ডাক্তারি সত্তা ও কল্পনা-প্রবণ কবি মনের আত্মপ্রকাশ ঘাটেছে এভাবে—

"কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। হ্যাঁ, জ্বর বই কি। তাঁহাকে বসিয়া চিঠি লিখিতেছি। অন্যায়, তবু লিখিলাম। সে অপরের বাগদত্তা জানিয়াও আমার কাব্য প্রেরণা কিছুমাত্র কমিতেছে না। জ্বরে প্রলাপ বকিতেছি।

মনের আকুতি বুঝাব কেমনে কথায় বলি,
কি করে প্রকাশ করিব বল না—কিছু না জানি,
গভীর সাগরে বাড়ব-অনল মরিছে জ্বলি,
বুঝাব কি করে সাগর-জলের জ্বালায় বাণী!"[৯]

বিগত স্বল্প কয়েকদিনের ডাক্তারি অভিজ্ঞতার দ্বারাই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বনফুল উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের মায়াখেলা। লীলা রায় এই ক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—

> "Balai Chand Mukherji, the powerful writer known as 'Banaphul', is a doctor by profession. Like Somerset Maugham, he looks at the world through the eyes of the medical practitioner and has had a medical man's opportunities for observation. This has affected his work in several ways. At least two of his books, *Trina Khanda* (Blades of Grass) and *Baitarini Tire* (On the Bank of the Styx) are fascinating case histories with the main story unfolding itself in off-the-record musings of the central character, the doctor himself."[১০]

উপন্যাসের নামকরণ ও বিষয়বস্তু থেকেই এ কথা স্পষ্ট যে লেখক চিকিৎসা অভিজ্ঞটাগুলিকে অবলম্বন করে জীবনের কোনও একটি বিশেষ দিককে উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই একটি নির্দিষ্ট চক্রে আবর্তিত হয়। আশার বশবর্তী হয়ে অথবা স্বার্থে আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সেই চক্রটিকে ভাঙবার চেষ্টা করে বা সেটা ভাঙার স্বপ্ন দেখে। আশা এই ক্ষেত্রে মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত নাচিয়ে চলেছে এবং মানুষও বোকার মতো নেচে চলেছে। উপন্যাসের মূল বিষয়টি লেখক একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন উপন্যাসের শেষ প্রান্তে এসে—

> "ম্যালেরিয়া, আমাশয়, বেরিবেরি, ফোড়া, দাদ— মানুষের ব্যাধিরও শেষ নাই, আমাদের অজ্ঞতারও শেষ নাই! অথচ মজ্জামান লোকে তৃণখণ্ড জানিয়াও তাহার দিকে হাত বাড়াইবে, ইহা তাহার মজ্জাগত দুর্বলতা। আমরা সেই হতভাগ্য তৃণখণ্ড। ভাসিয়া চলিয়াছি— ডুবন্ত মানুষ কখন আমাদের দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে!"[১১]

বনফুলের ডাক্তারি জীবনের আরেকটি প্রচ্ছন্ন দিক লুকিয়ে রয়েছে এই উপন্যাসের অন্য একটি অংশে। আগাগোড়াই আমরা উপন্যাসটিতে নায়ক-ডাক্তারকে একটি কল্পনা রাজ্যে ভেসে থাকতে দেখেছি। উপন্যাসের ১১ নম্বর অংশে তিনি একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। কোনও এক প্রেয়সীর সঙ্গে মুখোমুখি কথোপকথনে উঠে এসেছে একটি নাম। প্রেয়সী জানতে চেয়েছে যে সে আর কোনও নারীকে এমন করে ভালবেসেছে কি-না। উত্তরে ডক্তার বলেছেন—

> "হ্যাঁ- নার্স ব্রাউনকে!"
>
> "আর ?"
>
> "অত মনে নেই। তোমাকে পেয়ে সব্বাইকে ভুলে গেছি।"[১২]

বনফুল আত্মজীবনী 'পশ্চাৎপট'-এও এমন একজন স্কটল্যান্ডবাসী নার্সের কথা উল্লেখ করেছেন (ইচ্ছাকৃত ভাবে বনফুল তার নামটা উহ্য রেখেছেন) যাঁর উদ্দেশ্যে তিনি একটি ইংরাজি কবিতা লিখেছিলেন এবং তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন—

> "Evening speaks in golden clouds
> Morning speaks in light
> Flowers speak in scented petals
> Lightening speaks in flight.
> The manner in which they express
> Is simple, plain and sweet
> But what we do, we human beings?
> We know not how to do it.
> When the heart is full and feelings melting
> We try to hide and alter
> When the eyes speak the tongue denies
> Words fail of falter.
> I know not how to word my feelings
> How to call my muse
> I wish I had the knack of Nature
> To sing in Light and Hues."[১৩]

পরবর্তী সময়ে এই কবিতাংশটি তিনি 'ডানা' উপন্যাসে ব্যবহার করেছিলেন। লক্ষনীয় বিষয়, যে-সময় বনফুল এই উপন্যাসটি লিখছেন তার বহু আগেই তিনি তাঁর জীবনে স্ত্রী লীলাবতীর সঙ্গ পেয়েছিলেন এবং 'তোমাকে পেয়ে সব্বাইকে ভুলে গেছি' এই কথাগুলি নায়ক স্বপ্নের মধ্যে অনুভব করলেও লেখকের বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর একটি সংযোগ ছিল বলে বোঝা যায়।

উপন্যাসে লেখক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের শারীরিক ও রহস্যময় মানসিক দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করেছেন। মানুষের জীবন বৈচিত্র্যময়, অনিশ্চয়তায় ভরা। অথচ নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তারা সদা ব্যস্ত। পরিণাম অবশ্যম্ভাবী জেনেও তারা স্বপ্ন দেখতে ভোলে না। নিজেদের ক্ষমতা সীমিত জেনেও প্রাণপণে ছুটে চলে অনির্দিষ্টের দিকে। নিশীথ মুখোপাধ্যায়ের মতে—

> "ডাক্তার এখানে তাঁর মনের অনুবীক্ষণযন্ত্রে মানব মনের দুরারোগ্য ব্যাধির বিষাক্ত জীবানুগুলিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রবৃত্তিতাড়িত ভারসাম্যহীন মানুষগুলি কেমন ভাবে অসহায় তৃণখণ্ডের মত ভেসে চলেছে, বনফুল তারই চলমান ছবি এঁকেছেন এখানে। অবদমিত আকাঙ্ক্ষার তীব্র খরস্রোতে মানুষের রুচিবোধ কীভাবে সামান্য খড়কুটোর মতো ভেসে যায়, ডাক্তারী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা দেখিয়েছেন লেখক।"[১৪]

জীবনের এই অদ্ভুত মায়া-খেলা লেখকের মনে গভীর ভাবে ছায়া ফেলেছে। সব কিছুরই পরিণাম আছে, আর সেটা ভুলে থাকার প্রবণতা মানুষের মধ্যে প্রবল। তাই লেখক বলেছেন যে এই জীবন আজ আছে, হয়তো কাল থাকবে না, 'স্রোতমুখে তৃণ-খণ্ড'-এর মতো জীবনের স্রোতে ভেসে যেতে হবে তাকে।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখি যে কাহিনি শুরু হয়েছে এক ডাক্তারকে দিয়ে যিনি বিরহানলে দগ্ধ এক প্রেমিকও বটে। ডাক্তারের ভাবুক কবি-মন ডাক্তারি সত্তায় ফিরে আসে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ডাকে। স্ত্রী সম্পর্কে আগন্তুক বলেন—

> "বেশ ভাল মানুষ—যাত্রা শুনতে গেল। রাত ১১তা নাগাদ ফিরে এল— একটি বদ্ধ উন্মাদ।"[১৫]

পাগল মহিলাটির কণ্ঠে লেখক খুব সচেতন ভাবেই একটি গান সংযোজন করেছেন, 'কোথায় গেলি নন্দদুলাল/ কোথারে তুই ননী চোর—'। এরপরই সেই উন্মাদিনী অপেক্ষারত অন্য এক অভিভাবকের কোলের সন্তানের কাছে গিয়ে 'ছোঁ মারিয়া খোকাকে কাড়িয়া লইয়া প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিল।' ডাক্তার জ্বরে আক্রান্ত সেই খোকাকে উদ্ধার করলে মহিলাটি আক্ষেপ করে বলেন, 'আমার কাছে কোন খোকাই আসে না। কেউ আসে না...'। পূর্বের গানের 'ননী চোর নন্দদুলালের' সঙ্গে এই ঘটনাটিকে জোড়া লাগিয়ে ডাক্তার রোগের কারণ উদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং সেই প্রৌঢ়কে প্রশ্ন করেন, "কতদিন পূর্বে আপনার 'গনোরিয়া" হয়েছিল?" অর্থাৎ সেই ভদ্রলোকের যৌনরোগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই যে স্ত্রীর মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণ সে-কথা খুব কৌশলের সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়ে লেখক যেন এই কথাই বোঝাতে চাইছেন যে সমস্ত ঘটনাই প্রকৃতপক্ষে কোনো-না-কোনো ঘটনা বা কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

রোগীর শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসা করার পাশাপাশি যখনই গল্পের নায়ক-ডাক্তার সুযোগ পেয়েছেন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনকে উপলব্ধি করার পাশাপাশি নিজের ভাবুক কবি সত্ত্বাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি ভেবেছেন—

> "মানুষের অহরহ বিবর্তন। আজকের-আমি দশ বৎসর কেন, কয়েক মাস পরেই আর একজন লোক হইয়া যাইব।"[১৬]

এভাবেই লেখক উপন্যাসের আদি-মধ্য-অন্ত্যহীন অগতানুগতিক কাহিনিধারায় জীবনের গুঢ় ও রহস্যময় ভাবনাটিকে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে ধরার চেষ্টা করেছেন।

নায়ক চরিত্রের বহুমুখী রূপ:

এই উপন্যাসে নায়ক চরিত্রটিকে প্রধানত তিনটি রূপে আমরা পেয়ে থাকি, প্রথম ডাক্তার, দ্বিতীয়ত কবি এবং তৃতীয়ত দার্শনিক। রোগীর সংস্পর্শ ছাড়া তিনি বরাবরই একজন কবি তথা ভাবুক। লেখক বনফুল যেন তাঁর সকল কবিত্বসত্তা এখানে ঢেলে দিয়েছেন—

"সকালে উঠিয়া অবধি দেখিতেছি আকাশে বাতাসে বর্ষার আয়োজন... উঠানে কদম্ব গাছটায় অসংখ্য ফুল। হাতে কোন কাজকর্ম নাই, একটিও রোগীর দেখা নাই... অলসভাবে বিছানায় বসিয়া বর্ষা-সমারোহ দেখিতেছি। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'— মনে পড়িতেছে... বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

আজিকে যদিও সখী, আষাঢ়ের তৃতীয় দিবস
এবং যদিও নাম মোর
নহে কবি কালিদাস, নহি উজ্জয়িনীবাসী,
ছদ্মবেশ ত্যাগ করিতে পারি না!"[১৭]

কবিত্ব সত্তার চরম অনুভূতির মধ্যে দিয়ে নায়কের দার্শনিক সত্তা যেন ঝলক দিয়ে ওঠে,

> "চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, অথচ পারি না। এই যে সংযম, ইহাই তো জীবনের চরম ট্রাজেডি! হয়ত তাই এত সুন্দর!"[১৮]

নায়কের দার্শনিক-সত্তা সবসময় কবি-সত্তার অনুগামী, তবে ডাক্তারি-সত্তা ও কবি-মনের মধ্যে সবসময়ই একটা ফ্ল্যাকচুয়েশন লক্ষ করা যায়। তাই যখন নায়ক 'অবিশ্রান্ত বৃষ্টি', 'আকাশের গুরু গুরু ডাক' ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আপন মনের উচ্ছ্বাসের চিৎকারকে চেপে রাখছেন, ঠিক তখনই রোগীর আবির্ভাব ঘটিয়ে লেখক বনফুল কাহিনি-ভাবনার চলমানতায় যেন একটা নতুন মোড় এনে দিয়ে পাঠকে সজাগ করে তুলেছেন। আবার চিকিৎসা সমাপ্ত হলে সেই ডাক্তার যেন ফিরে এসেছেন নিজের কবিসত্তায়, ভাবুক মনটাকে নিয়ে গেছেন জীবনের গুঢ় রহস্যের সন্ধানে। এভাবেই নায়ক চরিত্রটি তিন বিন্দুযুক্ত একটি চক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে।

উপন্যাসের নামকরণ:

উপন্যাসের 'তৃণখণ্ড' নামকরণটি মূলত প্লটের ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে নায়ক আক্ষেপ করছেন, কারণ জীবনের চলমানতা অনেকটা একঘেয়েমি হয়ে উঠেছে তার কাছে। তবে সেই একঘেয়েমির মধ্যেও তার ডাক্তারি-সত্তা উপলব্ধি করেছে জীবনের মর্মবাণী—

> "ম্যালেরিয়া, আমাশয়, বেরিবেরি, ফোড়া, দাদ—মানুষের ব্যাধিরও শেষ নাই, আমাদের অজ্ঞতারও শেষ নাই! অথচ মজ্জমান লওকে তৃণখণ্ড জানিয়াও তাহার দিকে হাত বাড়াইবে, ইহা তাহার মজ্জাগত দুর্বলতা। আমরা সেই হতভাগ্য তৃণখণ্ড। ভাসিয়া চলিয়াছি—ডুবিন্ত মানুষ কখন আমাদের দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে!"[১৯]

নায়কের আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মমন্থনই এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। নিজের ভালোবাসার প্রতি সন্দিহান হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছেন নায়ক— "আচ্ছা তাহাকেও কি আমি ঠিক চিনিয়াছি? সে কি তাই, যাহা আমি ভাবি! সে তো আমার এত ভালবাসা অগ্রাহ্য করিয়া ওপরের বাগদত্তা হইয়া বসিয়া আছে!"[২০] মানুষের মন যে অতি আশ্চর্যকর সে-কথা উপন্যাসের অন্তে এসে যেন আরও প্রকট হয়ে উঠেছে লেখকের কলমে। আত্মবিশ্লেষণ করে লেখক ভাবছেন তার ডাক্তারি পেশার কথা। তার চিকিৎসায় রোগী কখনো বাঁচে, কখনো মৃত্যু হয়, টাকা রোজগার হয় এবং এভাব একঘেয়েমি জীবনে কখনো কখনো জীবনের প্রতি তার মনে বিতৃষ্ণাও জন্মে। কখনো 'কল' কম থাকলেও অশান্তিতে ভোগেন তিনি। মনের এই অস্থিরতাকে যেন তিনি কিছুতেই বশ মানাতে পারছেন না। নায়ক অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন, হয়তো সেজন্যই বুঝি শেষ বয়সে মানুষ ভগবানের সন্ধান করেন, অর্থাৎ এমন একটা জিনিসকে আশা করে যা পাওয়া যায় না, ফলে মোহ ফুরোয় না। নায়কও সেরকম 'না ফুরনো' বিষয়ের সন্ধান করতে গিয়ে চোখ বুজে ভগবানের সন্ধান করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তখনই আবার তার সেই প্রেমিক সত্তা জেগে উঠে, ভগবানের পরিবর্তে ভেসে ওঠে 'তার' ছবি, যার কথা নায়কের মনকে আঁকড়ে ধরে থাকে সারাক্ষণ। তাই তিনি বলে ওঠেন, 'অবর্ণনীয় সে চাহনি!' লেখক সেই মধু-স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চান। তিনি ডাক্তার, আপাতদৃষ্টিতে ইহজন্ম-পরজন্মের ধারণা তাকে প্রভাবিত করার কথা নয়। কিন্তু তার কবি-সত্তা যেন বার বার পরজন্মের বিশ্বাসকে উসকে দিয়ে তার আশাবাদী মনকে উজ্জীবিত করে রেখেছে, "বিশ্বাস করিতে ইচ্ছে হয়, এই জীবনের পরপারে আবার আমাদের মিলন হইবে।"[২১]

বিষ্ণু দে উল্লেখ করেছেন, "তৃণখণ্ড-এর মধ্যে জীবনমৃত্যুর যে আশ্চর্য রহস্য অভিব্যক্ত হয়েছে তার তুলনা খুব কমই মেলে।"[২২] কাব্যানুভূতি দিয়ে সমাপ্ত উপন্যাসের শেষটি তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ,

"স্রোতমুখে তৃণ-খণ্ড! বক্ষে তার প্রেম-মরীচিকা
দুঃখ সুখে কাঁপে তার স্নায়ু!
আঁধারে পড়িতে চাহে অদৃষ্টের রহস্য-লিপিকা
লয়ে অল্প অনিশ্চিত আয়ু!"[২৩]

উপসংহার:

জীবনের লীলাখেলায় মানুষ মৃত্যু কিংবা বিচ্ছেদকে অবশ্যম্ভাবী জেনেও গ্রাহ্য করতে অনিচ্ছুক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর নিশ্চিত পরিণতিকে পরাস্ত করতে চায় মানুষ। 'স্রোতমুখে তৃণ-খণ্ড' আকড়ে বাঁচার জন্য শ্বাস নিতে চায় অসহায় মানুষ। ডাক্তার-নায়ক এখানে যেন নিজেই 'তৃণখণ্ড' রূপে প্রতীক হিসেবে চিত্রিত, যাকে আঁকড়ে ধরে অগণন অসুস্থ মানুষ রক্ষা পেতে চাইছে, শ্বাস নিতে চাইছে, বাঁচতে চাইছে। অন্যদিকে নায়ক, যার কবিত্ব সত্তা তাকে বারে বারে ভাবুক তথা আবেগিক করে তুলেছে, সে-ও যেন স্রোত-মুখে ভেসে চলেছে 'তার' খেয়ালে। এখানে 'তার' বলতে সেই নায়িকাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে নায়কের কাছে সঞ্জীবনী শক্তি। ভাবপ্রধান এই উপন্যাসটিতে তাই 'তৃণখণ্ড' হচ্ছে একটি আশাবাদী সত্তা। কাহিনির নায়ক কখনো নিজে তৃণখণ্ডের ভূমিকায় রয়েছেন, আবার কখনো স্রোতমুখে হাত বাড়িয়ে অপরের বাগ্‌দত্তা সেই নায়িকাকে তৃণখণ্ডরূপে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। এখানেই ভাবপ্রধান এই উপন্যাসটির সার্থকতা। উপন্যাসটিতে আমরা লক্ষ করেছি যে তরুণ লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ডাক্তারি অভিজ্ঞতা, কবিত্বশক্তি, দার্শনিক ভাবনা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর সংমিশ্রণের মাধ্যমে নিজের প্রথম উপন্যাসটিকে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে কথাসাহিত্য রূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস বাংলা সাহিত্যধারাকে বৈচিত্র্য প্রদান করার পাশাপাশি সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

---

[১] বনফুল। পশ্চাৎপট। বাণীশিল্প, ১ম সংস্করণ ১৯৯৯। কলকাতা। পৃষ্ঠা ১০৭।

[২] ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ সালে (মস্কো) A.S. Suvorin –এর লেখা চিঠির অংশবিশেষ।
Internet Source:
https://ebooks.adelaide.edu.au/c/chekhov/anton/c51lt/chapter24.html, Dt.07.04.2016

[৩] বসু, রাজশেখর। বনফুল। বনফুলের শতবর্ষের আলোয় (পবিত্র সরকার সম্পাদিত)। বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, ১৯৯৯, কলকাতা। পৃষ্ঠা ৭৬।

[৪] বনফুল। কোথায় গেল সেই মেয়েরা। বনফুল প্রবন্ধ সংগ্রহ। সুজন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ২০১০। পৃষ্ঠা ২১৯

[৫] দাস, সজনীকান্ত। আত্মস্মৃতি। নাথ পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬। কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৯৫।

[৬] বনফুল। পশ্চাৎপট। পৃষ্ঠা ১৯৫।

[৭] তদেব, পৃষ্ঠা ১৯৯।

[৮] বনফুল। তৃণখণ্ড। বনফুল উপন্যাস সমগ্র (খণ্ড ১), নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯। পৃষ্ঠা ৪।

[৯] তদেব, পৃষ্ঠা ১।

[১০] রায়, লীলা। বনফুল। বনফুলের শতবর্ষের আলোয় (পবিত্র সরকার সম্পাদিত)। পৃষ্ঠা ৯১।

[১১] বনফুল। তৃণখণ্ড। বনফুল উপন্যাস সমগ্র (খণ্ড ১)। পৃষ্ঠা ৪১

[১২] তদেব, পৃষ্ঠা ৪৫।

[১৩] বনফুল। পশ্চাৎপট। পৃষ্ঠা ১৯৫।

[১৪] মুখোপাধ্যায়, নিশীথ। বনফুলের জীবন ও সাহিত্য। বর্ণালী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৮। কলকাতা। পৃষ্ঠা ৪১।

[১৫] বনফুল। তৃণখণ্ড। বনফুল উপন্যাস সমগ্র (খণ্ড ১)। পৃষ্ঠা ২।

[১৬] তদেব, পৃষ্ঠা ৪।

[১৭] তদেব, পৃষ্ঠা ১৩।

[১৮] তদেব, পৃষ্ঠা ১৪।

[১৯] তদেব, পৃষ্ঠা ৪১।

[২০] তদেব, পৃষ্ঠা ৫০।

[২১] তদেব, পৃষ্ঠা ৫১।

[২২] তদেব, চার, ভূমিকা।

[২৩] তদেব, পৃষ্ঠা ৫২।